বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—অবতার+ইকা=অবতারিকা, ইত্যাদি।

(ঙ) মধ্য যুগে বাংলা ছিল মুসলমান-শাসিত। ফলে মুসলমানদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বহু আরবী-ফারসী ও কিছু তুর্কী শব্দ এ ভাষায় গৃহীত হয়। যেমন—আরবী—গজল, আক্কল, আর্জি, আইন, কেতাব, খাজনা ইত্যাদি। ফারসী—খাস (ডিহিদার), দিলি (বাদশাহি), গোলাপ (<গুলাব) ইত্যাদি। তুর্কী—খাঁ, কাবুল, দারোগা, বিবি, বেগম ইত্যাদি। "পাতশা করেন খুব আশীর্বাদ তায়। গজব করিতে তুমি আক্কেল কায়ায়। লক্ষের দু-তিন লাখ আকমি তোমার। হাতী ঘোড়া উট খান খায় যে যার॥"

—ভারতচন্দ্র।

(চ) ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

এই যুগে পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। মঙ্গল কাব্যগুলির রচনা ছাড়াও উক্তদের দার্শনিক রচনাতে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন রীতির ত্রিপদী ছন্দেরও প্রয়োগ ছিল। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দের ব্যবহার ছিল।

(ছ) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদ এক সময় বাঙালীর খুবই প্রিয় ছিল। এই মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। মূলত মৈথিলী ভাষা ও অবহট্‌ঠ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে মধ্যযুগের বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা একটি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি করেন। তার নাম ব্রজবুলি ভাষা। কিন্তু বৈষ্ণব পদে এই ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—

"বাঁধা পাই, অনুগতজনে চাঁদ যায়। উহা উহা সহসী হইতে বহু যায়।
যে সরোবরে পদ্ম নিতি নিতি যায়। হায় কি সজনি যেই ছবি হয়॥"

—গোবিন্দদাস।

একটিমাত্র মূল অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট থেকে সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করে নি বা অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট স্তরে ভারতীয় আর্যভাষার একটি মাত্র রূপ ছিল না, অপভ্রষ্টের সাহিত্যিক নিদর্শনে আঞ্চলিক রূপভেদের চিহ্ন বিশেষ দেখা না গেলেও তার কথ্যরূপে নিশ্চয়ই আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল যে পার্থক্য অনেক আগে থেকে ভারতীয় আর্যভাষায় সূচিত হয়েছিল। প্রাকৃত-অপভ্রংশের এই যেসব আঞ্চলিক রূপভেদ বা উপভাষা ছিল সেই সব রূপভেদ থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় আরো আঞ্চলিক রূপভেদের ফলেই নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি পৃথক্-পৃথক্ রূপলাভ করেছে। ফলে এদের প্রত্যেকের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের পার্থক্যটি বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য নয়। বিবর্তনের ধারায় ভারতের আর্যভাষাগুলি কালগত বিচারে যে নব্য ভারতীয় আর্য পর্বে পদার্পণ করল, সেই পর্বের নবীনতার কিছু সাধারণ চিহ্ন আছে। নব্যভারতীয় আর্যভাষার নব্যতার যে সাধারণ অভিজ্ঞানগুলি তাদের পূর্ববর্তী পর্ব থেকে ভিন্নতর পর্বে এনে দিল ইতিহাসের ধারা বিচারে সেইগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার এই সব সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল :

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্তব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সমীভবনের নিয়মে সম ব্যঞ্জনে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। যেমন—নৃত্য>নচ্চ, বর্গ (=বর্‌গ)>বগ্গ, পক্ব>পক্ক, অক্ষি>অক্‌খি, হস্ত>হত্থ। এই সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্ম-ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেল এবং এই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হল। ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরের এই দীর্ঘীভবনকে বলে মাত্রাপূরক বা ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening)। যেমন—নচ্চ>নাচ (বাংলা), বগ্গ>বাগ (হিন্দী), পক্ক>পাক (হিন্দী), অক্‌খ>আঁখ (হিন্দী), হত্থ>হাথ (হিন্দী) /হাত (বাংলা)। উত্তর-পশ্চিমা প্রথমাবধি একটু রক্ষণশীল বলে এই উৎস থেকে জাত ভাষাগুলিতে (সিন্ধী, পঞ্জাবী) এই রকমের পরিবর্তন হয় নি। যেমন—কর্ম্ম>প্রাকৃত কম্ম>পঞ্জাবী কম্ম্, হস্ত>প্রাকৃত হত্থ> পঞ্জাবী>হত্থ্।

(খ) যে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনি নাসিক্য ব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ,ন, ম) সেই যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি লোপ পেয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী

(ঙ) তেমনি আবার 'মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা' আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, এমন সিদ্ধান্ত করেছেন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ হ-কার-যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন থেকে হ-কার লোপ পেয়েছে। যেমন—ণ্হ (ন্‌হ)>ন এবং ম্হ (ম্‌হ)>ম। যেমন—কাহ্ন>কানু, আম্হি>আমি। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিকে এ যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ 'কানু' ও 'আমি' শব্দের চেয়ে বরং 'কাহ্ন' ও 'আম্হি' শব্দের প্রয়োগই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী এবং 'ণ্হ', 'ম্হ' প্রভৃতি ধ্বনিসংযোগ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। যেমন—'বৌআলী পাতলী বালী আছো চন্দ্রাবলী', 'গোঠে হৈতে আসি আছি বুঢ়ী গোআলিনী', 'তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন মণীকের বাধে', 'কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে', 'বুঝিল তোহ্মার মন', 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী', 'পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে ত্রাসিলা মনে', 'তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞি নাহিঁ কিছু লাজ', 'কোকিলের নাদ শোকে যেহ্ন যমদূত' ইত্যাদি।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি (বিভক্তিহীনতা) প্রথম লক্ষণীয় রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ—'শীতল মনোহর বাঁশি কে না বাএ। তাহার বাঁশীএ বেহ কুম্ভিলী কাঢ়ে রাএ।'

(খ) আদি মধ্যযুগে মুখ্য কর্মেও বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—'অজেরে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোড়ি ডাঙ্গর কুআই ন দেহ। তুহ্ম এবেই সন্তার দেই জো চাইসি সো দেহি।'

(গ) গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে -ক ~ -কে ~ -রে বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন—'কংসকে বুঝিবে কন্যা আকাশে থাকিআঁ', 'হাথ পাঁচ বাণে তাক না কৈল দয়া', 'যমুনাক যাই হলে পানী আনিবার', 'সাপেরে কাঁখা দিবারে'।

(ঘ) পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্যে অপাদানের অর্থ প্রকাশ করা হত। যেমন—'গোঠে হৈতে আসি আছি বুঢ়ী গোআলিনী'। 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

(ঙ) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্যে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল -এর ~ -র, যে কারে হব -ক ~ -কের। যেমন 'বার্ত্তে বার্ত্তে কাহ্ন সে কাম করে। সুগ্রীবক পাখী, উত্তম জনের ইন্দ্রের খাঁখারে।' 'আঁচল সোনার ঘট', 'বড়ায়ি যমুনাক তিরে', 'আবাধী মেঘ তেহেন মুরারি'। 'ঢাহা ঢাহা আজ বড়ায়ি যমুনাক তিরে'

স্ত্রী লিঙ্গ বা পুং লিঙ্গ হয়েছে। যেমন সংস্কৃতে 'লতা' শব্দ স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু অনেক নব্য ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণয় করা হয় শব্দের অর্থ অনুসারে। যেমন—বাংলায় পুরুষবোধক শব্দ পুং লিঙ্গ, স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রী লিঙ্গ; অপ্রাণীবোধক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ (যেমন—'লতা' শব্দ বাংলায় ক্লীব লিঙ্গ)। আর কোনো-কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ অর্থনিরপেক্ষ হলেও সংস্কৃতের লিঙ্গ-বিধি থেকে তা স্বতন্ত্র হয়ে নিজস্ব প্রথানুসারে গড়ে উঠল। যেমন—সংস্কৃতে 'দধি' শব্দ ছিল ক্লীব লিঙ্গ, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্য হিন্দীতে দধি থেকে জাত শব্দ 'দহী' হল পুংলিঙ্গ, সিন্ধীতে 'দহী' স্ত্রী লিঙ্গ, মারাঠীতে 'দহিং' ক্লীব লিঙ্গ। সংস্কৃতে 'রশ্মি' পুংলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দীতে 'রশ্মি' স্ত্রী লিঙ্গ। সংস্কৃতে আত্মা (<আত্মন্) পুংলিঙ্গ, হিন্দীতে আত্মা স্ত্রী লিঙ্গ। বাংলা, গুজরাটী, সিন্ধী ভাষা ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ক্লীব লিঙ্গ অপ্রচলিত হয়ে গেছে; সাধারণত ক্লীব লিঙ্গবাচক শব্দ হয় স্ত্রী লিঙ্গ, নয় পুং লিঙ্গ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন—সংস্কৃতে 'ফল' শব্দ ক্লীব লিঙ্গ, কিন্তু হিন্দীতে 'ফল' শব্দ হয়েছে পুং লিঙ্গ। বাংলা সর্বনামে পুং লিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ ভেদ নেই ('আমি', 'তুমি', 'সে'—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ দুই-ই)।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রত্যেক কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল এবং শব্দের সঙ্গে এইসব বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে প্রায় প্রত্যেক কারকে শব্দের স্বতন্ত্র রূপ হত। কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যে এই বিভক্তিগুলি প্রায় সবই লুপ্ত হল। মাত্র দু'-একটি প্রাচীন বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ রয়ে গেল। যেমন—গৃহাণাম্>পঞ্জাবী ঘরাঁ। আর যেসব ক্ষেত্রে প্রাচীন বিভক্তিগুলি লুপ্ত হল সেসব ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্যে নতুন প্রত্যয়, প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ ও অনুসর্গের ব্যবহার প্রচলিত হল। যেমন—সম>হিন্দী সে (কলম সে=কলমের দ্বারা, ঘর সে=ঘর থেকে)। কর->-অর>বাংলা -র (যেমন ঘড়ির), *কের->বাংলা -এর (যেমন—ঘরের)। অগ্র->বাংলা আগে (আমার আগে তোমাকে মরতে হবে), কক্ষ->বাংলা কাছ (আমার কাছে বসো)। কিছু-কিছু অনুসর্গের অবক্ষয়িত রূপ বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—অনুসর্গ 'কৃত'>বাংলা -কে, হিন্দী -কো (বাংলা রামকে, হিন্দী রামকো)।

(গ) শব্দরূপের বিচারে নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় কারক পাই দুটি—মুখ্য কারক (Direct case) বা কর্তৃকারক এবং গৌণকারক বা তির্যক কারক (Oblique case)। সংস্কৃতে কর্তৃকারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল প্রথমা বিভক্তি।

আদিমধ্য বাংলা (Early Middle Bengali) :

আদিমধ্য যুগের (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ) বাংলা ভাষার একমাত্র প্রামাণিক নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই যুগে [illegible] ভাবে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্য এই পর্বের রচনা বলে ধরা হয়। কিন্তু এগুলি অধিকাংশই এই পর্বের শেষের দিকের রচনা এবং এগুলির ভাষা পরবর্তীকালে এত বেশী পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে এগুলিকে আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার প্রামাণিক নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাই শুধু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উপরে নির্ভর করে এই পর্বের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা হয়। (১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:—

(ক) 'আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা' এই যুগের বাংলার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলে কেউ-কেউ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই যুগের বাংলা ভাষার উচ্চারণ এখন পরীক্ষা করার উপায় নেই, সুতরাং এই ধ্বনিগুলি ক্ষীণ উচ্চারিত হত কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি (বিশেষত দ্বিতীয়টি যদি পদের শেষ ধ্বনি হয় তা হলে) ক্ষীণ উচ্চারিত হতে পারে এবং তার ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনি মিলিয়ে যৌগিক স্বর (diphthong) সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সেরকমের পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরের সংযোগ, শুধু 'আই' 'আউ' কেন, আরো অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। যেমন—আউ ('জাউ'), এউ ('দেউ'), ইআঁ ('পাঁসিআঁ') ইঅ ('তিঅজ'), অএ ('রএ'), এআ ('বেআকুলী'), ওআ ('গোআলিনী'), আই ('নাইল'), আএ ('যাএ, 'খাএ'), ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় পাশাপাশি দুই স্বরের স্থিতি' তার বৈশিষ্ট্য, এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণতা সম্বন্ধে আমরা অসংশয়িত নই। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে যে স্বরসংযোগ পাই তা থেকেই পরবর্তী কালের বাংলার বিভিন্ন যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) কোনো-কোনো ভাষাতত্ত্ববিদের মতে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের 'সরলীভবন' আদিমধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন—কান্তি>কাঁতি, ঝম্প>ঝাঁপ। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও সর্বত্র লক্ষ করা যায় না। এর বহুল ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। যেমন—চন্দ্রাবলী, কুম্ভার, আম্বি, ব্রহ্মা, কান্দো, নন্দন, নিন্দ ইত্যাদি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে তদ্ভব শব্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণের প্রবণতা সূচিত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সেটি তখনো ব্যাপক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে নি।

"তোমা কি হইতে বাঞ্ছিত পাইয়াছ
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

সুতরাং অপিনিহিতিকে এই যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যায় না।

(৬) মহাপ্রাণ নাসিক্য (অর্থাৎ বর্গের হ-যুক্ত পঞ্চম বর্ণ) অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের হ-বিহীন পঞ্চম বর্ণ) হতে আরম্ভ করেছিল আদিমধ্য যুগের বাংলাতেই ; অন্ত্য মধ্য যুগে এই প্রবণতা ব্যাপকতর হল। যেমন—আহ্মি> আমি, তুহ্মি>তুমি, আহ্মার>আমার, তোহ্মার>তোমার ইত্যাদি।

"প্রভু যেমন আমি যেই দিনে রাতি
মায়ের পীড়িত বাড়ি কেমনে বসা করিব।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী
"আমের আড়ালে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।"

কেউ-কেউ বলেছেন 'ঢ়'-এর মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে, অর্থাৎ 'ঢ়' হয়েছে 'ড়'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য অন্ত্যমধ্য যুগের শেষ দিকেও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। যেমন—

"ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিল চক্ষু খেয়ে॥" —ভারতচন্দ্র

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) আদিমধ্য বাংলায় সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তির প্রয়োগ সূচিত হয়েছিল। অন্ত্যমধ্য বাংলায় এই -রা বিভক্তি বিশেষ্যেরও কর্তৃকারকের বহুবচনে প্রযুক্ত হতে আরম্ভ করে। এছাড়া -গুলা –গুলি বিভক্তির প্রয়োগ নির্দেশক বহুবচনে তো হতই অনির্দেশক বহুবচনেও হত। যেমন—

"কে বলে শারদ শশী এ মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা॥"

(খ) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র' -র – এর ইত্যাদি। যেমন—

"হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥" —জ্ঞানদাস
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥" —ঐ

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ভৌগোলিক বর্গীকরণ (Geographical Classification of New Indo-Aryan) : মোটামুটিভাবে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির বর্তমান অবস্থান (distribution) বা প্রচলন-ক্ষেত্রের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ রেখে এগুলির ভৌগোলিক বর্গীকরণ করা যায় এইভাবে[৩১]—

(১) উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য)—সিন্ধী ও পাঞ্জাবী।

(২) মধ্যদেশীয়—পশ্চিমা হিন্দী (অর্থাৎ কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, বুন্দেলী, বঙ্গারু ও কনৌজী), পূর্বী পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী।

(৩) প্রাচ্য :—বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী।

(৪) দাক্ষিণাত্য :—মারাঠী ও কোঙ্কণী।

(৫) প্রাচ্য-মধ্য :—অবধী, বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী।

(৬) উত্তরা বা হিমালয়ী :—গোর্খালী ও নেপালী, কুমায়ুনী, গাড়োয়ালী।

॥ ৪৫ ॥

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Common Linguistic Features of New Indo-Aryan)

অপেক্ষাকৃত দূরতর উৎসের বিচারে ভারতের সব নবীন আর্যভাষাই এক উৎস থেকে জাত। সেই উৎসটি হল প্রাচীন ভারতীয় আর্য বৈদিক সংস্কৃত। কিন্তু যদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস বিচার করি তা হলে দেখব, সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এক উৎস থেকে জন্ম লাভ করে নি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের জন্ম, সেই প্রাকৃত-অপভ্রংশই হল নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "নব্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি এক মূল অপভ্রষ্ট ও তাহার কাণ্ড প্রত্ন নব্যভারতীয় আর্য হইতে উদ্গত", কিন্তু বাস্তবে

---

[৩১] Chatterji, Dr. Suniti Kumar : *Languages and Literatures of Modern India*. Calcutta, 1963, p. 32.

'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে লৌকিক হএ মুক্তি
স দেব সনে নেহা বাড়াইলে হবে বিষ্ণুপুরে স্থিতি।'
'এবার কাহ্নাঞি' বড় তৈল উপকার।
জনমে শুধিতেঁ নারো এ গুণ তোমার॥'
'যমুনা নদীর ধারা জুলিতেঁ পারি।
কেহে ধীরেঁ ধীরেঁ পুইলে মধুর বাণী।'

(৩) ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ পাদাকুলকে প্রতিপদে ছিল ষোলো মাত্রা। তা থেকে অর্বাচীন অপভ্রংশের ছন্দ চতুষ্পদীর জন্ম হয়। পাদাকুলকের একমাত্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চতুষ্পদীর প্রতি পদে দাঁড়ায় পনেরো মাত্রা। চতুষ্পদী থেকে বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হয় চর্যাগীতিতে। আদিমধ্য বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চতুষ্পদীর একমাত্রা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে পয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতি পদে চৌদ্দ মাত্রা। যেমন—

'যমুনার তীরে বাধা / কদমের তলে।=৮+৬
তরল করিলে কেহে / নয়ন যুগলে'।=৮+৬

এই পয়ার ছন্দ আদিমধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ। এ ছাড়া নানা ছাঁদের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়।

অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) :

অন্ত্যমধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের বাংলা ভাষা নানা ধারায় সমৃদ্ধ। যেমন—বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি। এই সব ধারার বিভিন্ন রচনায় এই যুগের বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত্য মধ্য যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করা হল :

(১) ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অ-কার লোপ পেল।

যেমন—'আর্ শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা /
কোণের ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।'

অসমাপিকাটির পরবর্তী অংশের ধ্বনি-পরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হয় (যেমন—করিয়া > করে ইত্যাদি)।

(৫) আধুনিক চলিত বাংলার শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বিষম স্বরধ্বনি স্বরসংগতির প্রভাবে সমীভূত হয়ে একই রকম বা প্রায়-একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—দেশি > দিশি, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

(৬) মূল ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে -অনট্ (অন) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ রচনা করা হয়। যেমন—গম্ + অনট্ (অন) = গমন, স্না + অনট্ (অন) = স্নান, গ্রহ্ + অনট্ (অন) = গ্রহণ, জ্ঞা + সন্ (ইচ্ছার্থে) + অ (ভাবে) + আপ্ (স্ত্রী) = জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। তারপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে কৃ (কর্) ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নানা যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন—গমন করা, গ্রহণ করা, স্নান করা, জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। এই রকমের যৌগিক ক্রিয়াপদ প্রথমে সাধুভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। পরে কিছু-কিছু যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলিত ভাষাতেও স্বাভাবিক হয়ে উঠে। যেমন—স্নান করা, জিজ্ঞাসা করা, দান করা ইত্যাদি। অন্যদিকে সাধুভাষা যতই সরল ও স্বাভাবিক হয়ে আসে ততই সাধু ভাষাতে আবার যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমে আসে।

(৭) আধুনিক বাংলায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের (Conjuction) ('ও', 'এবং') ব্যবহার খুব বেশী। এই দুটির মধ্যে 'এবং' সাধারণত দুটি বাক্যকে যোগ করে, 'ও' যোগ করে দুটি পদকে, যদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম কম নয়। এই দুটি সংযোজক অব্যয়ের মধ্যে 'এবং' আগে থেকেই প্রচলিত। 'ও' হল আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এটি ফারসী 'ব' (wa) থেকে এসেছে।

(৮) আধুনিক বাংলায় বাক্য-গঠনরীতির একাধিক বৈশিষ্ট্যের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৪১১-৪২০)। একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নাই', 'নি' বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে (যেমন—রামচন্দ্র সত্যাগ্রহ করেন নি), এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে (যেমন—রামচন্দ্র সত্যাগ্রহ না করে চিরকাল সৎপথে চলেছেন)। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় এবং নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে। যেমন—মেয়েটি না স্নান করল, না খেলো, না ঘুমালো, সারাদিন মন খারাপ করে চুপ করে বসে রইল।

স্বরধ্বনি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয়ে অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন—কণ্টক>প্রাকৃত
>কণ্টঅ>বাংলা কাঁটা। পঞ্চ>বাংলা ও হিন্দী পাঁচ। দন্ত>বাংলা ও
হিন্দী দাঁত। কিন্তু পাঞ্জাবী ও সিন্ধীতে এই নাসিক্য ব্যঞ্জনটি লোপ পায় নি,
ফলে পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিকও হয় নি। যেমন—কণ্টক>প্রাকৃত কণ্টঅ>
সিন্ধী কণ্ডো, দন্ত>পাঞ্জাবী দন্দ, সিন্ধী দন্দু।

(গ) পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়েছে অথবা বিকৃত
হয়েছে। যেমন—সংস্কৃত রাম (র্+আ+ম্+অ)>বাংলা, হিন্দী রাম্
(র্+আ+ম্), অগ্নি>হিন্দী আগ্। দধি>হিন্দী দহী। পদান্তিক
স্বরধ্বনি অবশ্য অনেকটা রক্ষিত হয়েছে ওড়িয়া ভাষায়; যেমন—ওড়িয়া
রাম=র্+আ+ম্+অ।

(ঘ) দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয়
আর্যভাষার কোনো-কোনো উপভাষায় লুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ঐ ব্যঞ্জনের
সংশ্লিষ্ট স্বরটি লোপ পেত না। এই সংরক্ষিত স্বরকে বলা হয় অবশিষ্ট
বা উদ্বৃত্ত স্বর (residual vowel)। যেমন ঘৃত (ঘ্+ঋ+ত্+অ)
>ঘিঅ (ঘ্+ই+অ)। এখানে 'ত্' লোপ পেয়েছে, এবং তৎ-
সংলগ্ন 'অ' থেকে গেছে। এই 'অ' হল অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত স্বর।
নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে এই ধরনের উদ্বৃত্ত স্বরের নানা রকম পরিণতি
হয়েছে। কখনো এই উদ্বৃত্ত স্বর লোপ পেয়েছে। যেমন—ঘৃত>ঘিঅ>
বাংলা ঘী, মৌক্তিক>মোত্তিঅ>বাংলা ও হিন্দী মোতী। কখনো উদ্বৃত্ত
স্বরটির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী স্বরের সন্ধি হয়ে গেছে। যেমন গত>গঅ, গঅ।
ইল্ল>বাংলা গেল (অ+ই=এ)। কখনো বা উদ্বৃত্ত স্বরটি পার্শ্ববর্তী
স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বরে (Dipithong) পরিণত হয়েছে। যেমন—
বধূ>বউ>বৌ, মধু>মউ>মৌ (বাংলা)।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণয় করা হত অনেক ক্ষেত্রে পদান্তিক
স্বরধ্বনি অনুসারে। যেমন—ঈ-কারান্ত শব্দ 'নদী'—স্ত্রী লিঙ্গ, আকারান্ত শব্দ
'লতা'—স্ত্রী লিঙ্গ। পদের অন্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হওয়ায়
প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার লিঙ্গবিধি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় থাকে নি।
নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় লিঙ্গবিধি অনেক ক্ষেত্রে নতুন ধরনের। প্রাচীন
ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্ণীত হত অনেকক্ষেত্রে শব্দের অর্থ নিরপেক্ষভাবে শব্দের
গঠন অনুসারে। ফলে অপ্রাণীবাচক শব্দও কখনো-কখনো ক্লীবলিঙ্গ না হয়ে

॥ ৪৮ ॥

মধ্যবাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(Linguistic Features of Middle Bengali)

সাধারণত মধ্যবাংলার ব্যাপ্তি ধরা হয় ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকালের দুই প্রান্তের এই কালসীমার কোনোটিই তর্কাতীত নয়। এর সূচনাকাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং ডঃ সুকুমার সেন : "চতুর্দশ শতাব্দে ও পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা বাঁধিয়া নিশ্চিতভাবে নেওয়া যাইতে পারে এমন কোন রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ অবধি শতাব্দ কালের কতটা প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।"[৩৩] অন্য প্রান্তটি সম্পর্কেও আবার তিনিই তর্কের অবতারণা করেছেন : "শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখিলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের শেষসীমা ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। তবে সেই সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহারের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ ধরিতে হয়।"[৩৪] মধ্যযুগের সূচনাকাল সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের সংশয় বিষয়ে কিছু বলার নেই ; কিন্তু মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল সম্পর্কে আমরা অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে, লোকের মুখ থেকে মধ্যযুগের জীবন্ত কথাভাষার নিদর্শন পাবার এখন আর কোনো উপায় নেই, শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রূপ ধরেই এই পর্বের ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সালটিকেই (১৭৬০) মধ্যযুগের সমাপ্তিলগ্ন বলে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং আমরা মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আনুমানিক ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগের বিস্তৃতিকাল। তা হলে মধ্যযুগের বিস্তৃতিকাল প্রায় চার শ' বছর। এই চার শ' বছর ধরে কোনো জীবন্ত ভাষা একরূপে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। এই বিস্তৃত পর্বের মধ্যে বাংলা ভাষারও লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছিল। সেই পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে এই পর্বকে দুটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে—আদিমধ্য (১০৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ) ও অন্ত্যমধ্য (১৫০০ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ)।

'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

প্রাচীন বাংলাতেই কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। সংস্কৃত করণ কারকের বহুবচন পদ *তুষ্মাভিঃ (যুষ্মাভিঃ) (>প্রাকৃত তুম্হাহি, >অপভ্রংশে তুম্হহি) থেকে আগত পদ তুম্হে (তুম্হে) প্রাচীন বাংলায় কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপে ক্বচিৎ কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—ভণই গুই আমহে কাণে গিআ। অথবা বৈদিক অস্মে' অর্থাৎ, বহুবচনের পদ অস্মে>প্রা অম্হে (স্ম>ম্হ ; হ্ম>ম্হ ; বিপর্যাস)>প্রা-বাং আমহে / অম্হে>অম্‌হি>ম-বাং আমি>আ-বাং আমি (ম্হ>ম্‌হ>ম : মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ)।

(ঞ) ক্রিয়ারূপে বর্তমান কালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে -মি ~ -মুঁ, মধ্যম পুরুষে -সি এবং প্রথম পুরুষে -ই। যেমন—হা লো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে। আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ। (হাঁ রে ডোমনী, তোকে সাদামনে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—তুই কার নৌকোয় আসা যাওয়া করিস রে), চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিঅ লেহুঁ (চৌষট্টিটি ঘর গুনে নিই), গুরু ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ (গুরু বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও)। এখানে উত্তম পুরুষ—পুচ্ছমি, লেহুঁ ; মধ্যম পুরুষ—আইসসি, জাসি, প্রথম পুরুষে—ভণই)।

(ট) অতীত কালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত দু'ভাবে : নিষ্ঠান্ত পদ (past participle) দিয়ে এবং ধাতুর সঙ্গে -ল বা -ইল প্রত্যয় যোগ করে। যেমন—নিষ্ঠান্ত পদের সাহায্যে : গম্+ক্ত=গত>গঅ>গউ—সসহর গউ নিবাণে (শশধর নির্বাণে গত হল) ; প্র—√বিশ্+ক্ত=প্রবিষ্ট>পাইট্‌ঠ>পইঠ>পাইঠো : চঞ্চল চীএ পইঠো কাল (চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)। ল ~ -ইল—প্রত্যয় যোগ করে : যেমন—দেখ্+ইল=দেখিল—মই দেখিল (আমি দেখিলাম)। হু+ইল=হুইল+ই=হুইলী। সবরী নিচেতন হুইলী (শবরী নিশ্চেতন হল)। গম্+ল=গেল—সসুরা নিদ গেল (শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল)। -ল ~ -ইল-যুক্ত ক্রিয়ারূপগুলি প্রথমে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে বিধেয় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত ; এইজন্যে এইগুলির পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক রূপ হত। যেমন—সসুরা নিদ গেল (পুং), সবরী নিচেতন হুইলী (স্ত্রী)। ব্যতিক্রম—আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। -ল ~ -ইল প্রত্যয়ান্ত পদ যে মূলত বিশেষণ ছিল তার প্রমাণ বিশেষ্যের পূর্বে তার ব্যবহার থেকেই পাওয়া যায়। যেমন—দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় (দোয়া দুধ কি আবার বাঁটে প্রবেশ করে?)।

(ঙ) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত -ইব যোগ করে। যেমন— মই ভাইব (আমি ভাববো)।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত তিন ভাবে। যেমন— এক : ধাতুর সঙ্গে নিষ্ঠা প্রত্যয় যোগে নিষ্ঠান্ত পদ (past participle) গঠনার পর তার সঙ্গে -এ বিভক্তি যোগ করে : যেমন—চড়্ + ইল=চড়িল, চড়িল + এ = চড়িলে—সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বামে মা হোহী (সাঙ্কমে চড়লে ডাইনে বামে যুরো না)। দুই : শতৃ পদের (present participle) সাহায্যে : যেমন—বুড়্ + অন্ত = বুড়ন্ত, বুড়ন্ত + এ = বুড়ন্তে— মই বুড়ন্তে বিসিস ন দিঅ (আমি এখন বুড়িতে যাওয়াতে কিছু দেখতে পাই না)। তিন : -ই (ঈ) ~ইঅ ~ইআ প্রত্যয় যোগ করে : কিঅ কারিঅ মহাসুহ পরিমাণ দুই তবই গুরু পুচ্ছিঅ জান (ভূ করে মহাসুখ পরিমাণ কর দুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো)।

চর্যাপদে এমন কিছু-কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগের কথা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যা বাংলা ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন—ধুণিআ লেহুঁ (ধুণে নিই), দুহিল দুধু (দোয়া দুধ) ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অল্পসংখ্যক প্রয়োগের জোরে এমন দাবী করা যায় না যে শুধু বাংলার সঙ্গেই চর্যার ভাষার সাদৃশ্য আছে। কর্তার লিঙ্গভেদ অনুসারে ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ (পুং—সহজ নিব গেল, স্ত্রী—সবরী নিদেতন ভইলী) এবং 'শ' স্থানে 'স'-এর বহুল ব্যবহার হিন্দীর সঙ্গেও চর্যার ভাষার সম্পর্ক প্রতিপন্ন করে।

ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য :

"প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছন্দোবন্ধ ছিল : (ক) ষোল মাত্রার পাদাকুলক (<সং পদাকুলিকা) (খ) চব্বিশ মাত্রার (১৩।১১) দোহা, এবং (গ) ত্রিশ মাত্রার (১০।৮।১২) চউপইআ। এই ছন্দোবন্ধগুলি থেকেই সম্ভবত বাংলা কাব্যে যথাক্রমে পয়ার (৮।৬), লঘু ত্রিপদী (৬।৬।৮) বা মহাপয়ার এবং দীর্ঘ ত্রিপদী (৮।৮।১০) জন্মলাভ করেছিল।" (দ্র নী 'চর্যাগীতিকোষ', ১৯৭৮, পৃঃ ঢ)। চর্যার পাদাকুলক ছন্দই প্রধান। উদা

I I I I   I I   I I I I   I I
দুলি দুহি । পিটা ॥ ধরণ ন । জাই ।
I I I   I I I   I I I I   I I
রুখের । তেন্তলি ॥ কুম্ভীরে । খাঅ ॥

I I I   I I I I   I I I
আঙ্গণ । ঘরপণ ॥ সুন ভো । বিআ
I I I   I I   I I I I
কানেট । চৌরি ॥ নিল অধ । রা

রচনা করেছিলেন বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ। এতে যে প্রায় চারশ বাংলা শব্দ আছে সেগুলিকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে ধরা হয়। আর সেকশুভোদয়া সম্পর্কিত যে দু'চারটি বিক্ষিপ্ত বাংলা গান পাওয়া যায় সেগুলিকেও প্রাচীন বাংলার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়। আর আছে ধর্মদাসের রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডন'-এ দু-চারটি বাংলা ছড়া ও কবিতা।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সমীভূত হয়ে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল (পর্বত>পব্বত, কর্ম>কম্ম)। প্রাচীন বাংলায় এই যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হল (যেমন—পব্বত>পবত, কম্ম>কম) এবং এই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল (যেমন—পবত=প্+অ+ব্+অ+ত্+অ>পাবত=প্+আ+ব্+অ+ত্+অ, কম=ক্+অ+ম্+অ>কাম=ক+আ+ম্+অ)। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘ হয়নি। যেমন—মিথ্যা>মিছা। নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনও অনেক সময় সমীভূত হয়নি; তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে। যেমন—বন্ধ>বান্ধ, চন্দ্র>চান্দ।

(খ) নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেল এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল। যেমন—শব্দেন>সাদেঁ।

(গ) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় ছিল, অর্থাৎ দুটি মিলে একটি স্বরে পরিণত হয় নি। যেমন—উদাস>উআস। কিন্তু পদের অন্তে অবস্থিত একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে উচ্চারিত হত এবং ক্রমে দুটি মিলে একক স্বরে পরিণত হল। যেমন—ভর্তি>ভতই(=ভ্+অ+ত্+অ+ই>ভ্+অ+ত্+অই), পুস্তিকা>পোথিআ(=প্+ও+থ্+ই+আ>প্+ও+থ্+ইআ)>পোথী(=প্+ও+থ্+ঈ)।

(ঘ) পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে প্রায়ই একটি শ্রুতিধ্বনি (glide) রূপে এসে যেত। যেমন—নিকটে>*নিঅড়ী (ন্+ই+অ+ড়্+ঈ)>নিয়ড়ী (ন্+ই+য়্+অ+ড়্+ঈ)>নিয়ড়ি।

(ঙ) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত হয়।

(গ) -ই -এ -তে সপ্তমী বিভক্তি রূপে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন—

"উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥" —মুকুন্দ চক্রবর্তী
"ফুল্লরার দুঃখে হৈয়া কান্দয়ে চণ্ডিকা।
মিথ্যা এত নিন্দা কেন কর প্রাণী।"—মুকুন্দ চক্রবর্তী

(ঘ) সাধারণ সরল অতীত কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল ইলাঙ্ -ইলাম এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল -ইল -ইল ইত্যাদি। যেমন—

উত্তম পুরুষ—

"সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।"—মুকুন্দ চক্রবর্তী

প্রথম পুরুষ—

"ধনি ধনি কলিকালে রঘু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ হৈলা সেই ত নগর ॥" —ঐ

(ঙ) সাধারণ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল -ইব। যেমন—

"সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার ॥" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(চ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপের সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে তথাকথিত যৌগিক কালের (বহুভাবিত কালের) রূপ গঠন করা হ'ত। যেমন—

"গোলিকা রান্ধ্যাছি বাঁধি দিয়া জল ধড়া।
হাত উড়াইয়া পোহায় কর শীত-পোড়া।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(রান্ধ্যাছি < রান্ধিয়া + আছি—এখানে √রান্ধ্ ও √আছ্—দুটি ধা
আছে।)

(ছ) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার স
ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করা হত। নামধাতুর এই প্রচুর ব্যবহার ব

অধিকরণ কারক প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। ফলে অধিকরণের মত একই বিভক্তি চোখে পড়ে। যেমন—ঘরে'।

(খ) অধিকরণের আরো বিভক্তি ছিল -ই ~-এ ~-হি ~-তেঁ ~-ত, যেমন—নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লঙ্ক।

উজল চাঁএ পইঠো কাল (উজল দিয়ে কাল প্রবিষ্ট হল)। আইমনি দুলখী পাঅ পাইউ, কোড়ি মাঝে একু হিঅহিঁ সমাইউ। (এমন দুরূহপদ পাইল কোটি লোকের মধ্যে একের হৃদয়ে তা প্রবেশ করল)। সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই, সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই (এ সমাধি সাধন করে কি হবে? সুখে দুঃখে তো মরতেই হবে)। হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী (হাঁড়িতে ভাত নেই)।

(গ) অধিকরণের বিভক্তিগুলির মধ্যে -এ বিভক্তির প্রয়োগ ছিল ব্যাপক। এত ব্যাপক যে অন্যান্য কারকের অর্থ প্রকাশ করার জন্যেও এই বিভক্তি তির্যক ব্যবহার ছিল। যেমন—কর্তৃকারকের অর্থে—কানেট চোরে নিল ক গই মাগঅ (কানের দুল চোরে নিল, কোথায় গিয়ে চাওয়া যায়); অপাদানের অর্থে—জামে কাম কি কামে জাম (জন্ম থেকে কর্ম হয়, না কর্ম থেকে জন্ম হয়?)।

(ঘ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল -এর ~-র ~-ক। যেমন—রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ (গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়), মোহোর মিলন কহণ ন জাই (আমাদের মিলনসুখের কথা বলা যায় না)। এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস (ছন্দের বন্ধ ও ইন্দ্রিয়পটুতার আশা ত্যাগ করো)।

(ঙ) তির্যক বিভক্তি ছাড়া অপাদানের নিজস্ব বিভক্তি ছিল -হুঁ। যেমন—রঅণহু (<রত্নাৎ=রত্ন থেকে)।

(চ) বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করার জন্য যেসব শব্দ বিভক্তির মতো ব্যবহৃত হয়, অথচ যেগুলি বিভক্তির মতো মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় না সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। এই রকম অনুসর্গের ব্যবহার প্রাচীন বাংলাতেই সূচিত হয়েছিল। যেমন—নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির স্থানে 'অন্তরে'—তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী (তোর জন্যে আমি হাড়ের মালা নিলাম)।

(ছ) সংস্কৃত করণ কারকের বহুবচনের পদ অর্থাভিঃ (>প্রাকৃত অত্থহি >অপভ্রংশ অত্থহিঁ) থেকে আসছে অন্তরে (আসে, আছে, আছে, আছ)

প্রাচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(Linguistic Features of Old Bengali)

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের বিস্তৃতিকাল হল আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে কালপর্ব সেই পর্বের মধ্যে রচিত বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে এমন কোনো বাংলা রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেই জন্যে ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বটিকে অনুর্বর পর্ব (barren period) বলা হয়। এই পর্বের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় নি বলে এর বৈশিষ্ট্যও আমরা জানতে পারি না; তাই এই পর্বটিকে অন্ধকার যুগও বলা যায়। এইজন্যে এই পর্বটিকে বাদ দিয়েই অনেকে বলে থাকেন প্রাচীন যুগের বিস্তারকাল হল ৯০০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের রচিত চর্যাগীতিগুলিতে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত এই সাধনসঙ্গীতগুলি নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে-র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' অংশে প্রথম প্রকাশ করেন (১৯১৬) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরবর্তী কালে এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (The Origin and Development of the Bengali Language), ডঃ সুকুমার সেন (চর্যাগীতি পদাবলী), ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় (Old Bengali Language and Text এবং চর্যাগীতি), ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার (বাঙলা ভাষাপরিক্রমা, ২য় খণ্ড)। চর্যার ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যিক গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (Les Chants Mistique de Kanha et Saraha), ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (Obscure Religious Cults, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি), ডঃ সুকুমার সেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড), এবং ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড) ; এবং চর্যার একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি সংকলন প্রকাশ করেন ডঃ নীলরতন সেন (চর্যাগীতিকোষ)। চর্যাগীতি ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি নিতান্তই নগণ্য। অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থ 'অমরকোষে'র টীকা

(৯) একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে জোড় দিয়ে যৌগিক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন—রামচন্দ্র বনে গেলেন এবং পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন। এখন সংযোজক অব্যয় দিয়ে জোড় না দিয়ে পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে বাক্য দুটিকে যোগ করে একটিমাত্র সরল বাক্য রচনা করা যায়। এটি আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। যেমন—রামচন্দ্র বনে গিয়ে পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন।

(১০) আধুনিক যুগে বাঙালীর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্য—বিশেষত পাশ্চাত্য ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির—যোগ স্থাপিত হয়। তার ফলে ভাষাখণ্ডের বিভিন্ন সূত্র ধরে বাংলায় বিভিন্ন ভাষা থেকে উপাদান গৃহীত হয়। প্রধানত ইংরেজী ভাষা থেকে বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়। যেমন—চেয়ার (chair), টেবিল (table), রেডিও (radio) ইত্যাদি। কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ বাংলায় গৃহীত হবার পর বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের সঙ্গে মিশে এমন পরিবর্তিত হয়ে দেশীয় (naturalised) রূপ লাভ করেছে যে তাদের বিদেশী শব্দ বলে চেনাই যায় না। যেমন—lord > লাট, chord > কার (লাল কার, কালো কার), lantern > লণ্ঠন ইত্যাদি। শব্দ ছাড়াও কিছু-কিছু বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন—university > বিশ্ববিদ্যালয়, wrist watch > হাতঘড়ি, He will place his opinion now > এখন তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন। ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা থেকেও বহু শব্দ আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—পর্তুগীজ :—আনারস, আলপিন, আলমারি ইত্যাদি; ফরাসী :—কুপন, বুর্জোয়া ইত্যাদি; ইতালীয় :—কো ইত্যাদি; জার্মান :—জার, নাৎসী ইত্যাদি; রাশিয়ান :—সোভিয়েত ইত্যাদি; হিন্দী :—লাগাতার বন্ধ, বাতাবরণ, জাঠা ইত্যাদি।

(১১) ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরানো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও চৌত্রিশ ছন্দের জন্ম তো হলই, আধুনিক কবিতায় গদ্যছন্দেরও সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় ইংরেজী ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।

কিন্তু এই সূত্রের ব্যতিক্রমও ছিল মনে হয়। যেমন—

'তৈলক দিনে তৈলক স্নান করিল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।'—মুকুন্দ চক্রবর্তী

(খ) পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অকার লোপ পায়নি, উচ্চারিত হত। যেমন—

'মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।'—মুকুন্দ চক্রবর্তী

(গ) পদের অন্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অকার-চিহ্ন স্বরধ্বনিও রক্ষিত হয়েছে, লোপ পায়নি। যেমন—

'বিদেশে বামন জাতি বড় নাদাসার।
আপনারা এক বাপে আরে বসে আর।।'—ভারতচন্দ্র

(ঘ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর অনেক সময় লোপ পেয়েছে। যেমন—হরিদ্রা>হলুদি। 'হলদিবরণ গোরাইল পড়ায় গেল হাথে।' কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি মধ্যবাংলায় ব্যাপক হয়নি। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত বরং বেশী পাওয়া যায়। যেমন—

'হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা।
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা।।' —মুকুন্দ চক্রবর্তী

(ঙ) অন্ত্যমধ্য যুগে শব্দমধ্যস্থ 'ই' ও 'উ' অপিনিহিতি বা বিপর্যাস প্রক্রিয়ার কখনো-কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে এসেছে। 'উ' কখনো-কখনো 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—বেগুন > *বেউগন > বাইগন।—

"শাক বাইগন মূলা আড়ি-থোড় কাঁচকলা
সকলে পূরিয়া লয় পাতি।"—মুকুন্দ চক্রবর্তী

কখনো-কখনো বিপর্যাস বা অপিনিহিতির ফলে আগে সরে আসা 'ই' ও 'উ' লোপ পেয়েছে। যেমন—রাখিয়াছি>*রাইখ্যাছি>রাখ্যাছি।

"গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল-দড়া
হাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক-পোড়া।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

কিন্তু এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যাপক হয়ে দেখা দেয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপিনিহিতির পূর্ববর্তী রূপই দেখা যায়। যেমন—'কইর‍্যা' বা 'কর্যা'র বদলে করিয়া প্রভৃতি রূপই বেশী। যেমন—

"করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা মোরে করিলা পার্বতী।" —মুকুন্দ চক্রবর্তী

লাহীক কত বাকে আঁকুয়াম। আলিঙ্গন দিআঁ মোর রাখহ পরাণ।
'তিরীর যৌবন রাত্রির সপন যেহ নদীকের বাণে'।
'আছিলা দেবের সুরতি সুখী।'

(চ) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হত -ই ~ তে ~এ। যেমন—'রাধার হিআত মাইল সুতর সন্ধান'। 'মদনবাণে পরাণে আকুলী॥'

(ছ) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আমে ~মোঁ এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ ~তোমে ইত্যাদি। এইগুলির সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি যোগ হত।

(জ) সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তি যুক্ত হত। যেমন—'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'। 'পুছিল তোহ্মরা যে উত্তরিলা মনে' ইত্যাদি।

(ঝ) ক্রিয়া-বিভক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় উত্তমপুরুষে বর্তমান কালে -ওঁ ~ -ই, অতীত কালে -লোঁ ~ -ইল ও ভবিষ্যৎকালে -ইবোঁ বিভক্তি। যেমন—'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী। ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।' 'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ'। 'একলী ঢেলোঁ না যেন ঘোর বনে'। ছাড়িবোঁ মো মহাদান তেজিবোঁ মো বাটে। তবে বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা। দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।'

(ঞ) ধাতুর সঙ্গে -ই ~ ইআঁ ~ত ~ইতেঁ ~ইলে যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত। যেমন—

'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।'
'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।——
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর
যোগিনীরূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর।'
'অযোড়-যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি
সে কি রাধিকা হৈল সীতা সতী নারী।'

যেমন—মহাসুখ (ম্+অ+হ্+আ+স্+উ+খ্+অ) > মহাসুহ (ম্+অ+হ্+আ+স্+উ+হ্+অ), কথন (ক্+অ+থ্+অ+ন্+অ)> কহন (ক্+অ+হ্+অ+ন্+অ)।

(চ) 'শ' স্থানে 'স'-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস (<আশা), সুনুপাখ (শূন্যপাখা) ভিতি লাহু রে পাস (পাশ) (ছন্দের গুঁড়ার আশা ছাড়া হোক, শূন্যরূপ পাখা পাশে ভিড়ে ধর)।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :—

(ক) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি (বিভক্তিহীনতা) প্রাচীন বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন—চঞ্চল চীএ পইঠো কাল (চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)। কখনো-কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায় 'এ'-বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন—রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খায় (গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়)।

(খ) কোনো-কোনো ক্রিয়ার দু'টি করে কর্ম থাকে :—মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়াটির প্রসঙ্গে 'কি' প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম এবং 'কাকে' প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম। সাধারণত মুখ্যকর্ম অপ্রাণীবাচক কর্ম ও গৌণ কর্মই প্রাণীবাচক কর্ম হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলা থেকেই গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকের রূপ একই রকম হয়ে থাকে। বাংলায় প্রায়ই গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে—ক/কে/রে বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন—লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান (লুই বলে—গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও) এখানে 'গুরু'-তে শূন্য বিভক্তি। মন্তি এঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা (মন্ত্রীর দ্বারা রাজাকে পরিবৃত করা হয়েছে অথবা মন্ত্রীর দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়েছে)। ঠাকুরক (=রাজাকে)—এখানে -ক বিভক্তি। কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই (কেউ-কেউ তোকে বিরূপ কথা বলে)। তোহোরে (তোকে)—এখানে -রে বিভক্তি)।

মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি দেখা যায় : যেমন—সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ। কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥ (শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল, বউ জেগে আছে, কানের দুল চোরে নিয়ে গেল, কোথায় গিয়ে চাওয়া যায়) (কানেট=শূন্য বিভক্তি)।

(গ) করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল -এঁ (<এন)। যেমন—মন্তিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা, (মন্তিএঁ=এঁ বিভক্তি), করণ ও

॥ ২৯ ॥

আধুনিক বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Modern Bengali)

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরটিকে আমরা বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলতে পারি। মোটামুটিভাবে তা হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের বিস্তৃতিকাল। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হল :—

(১) অনেকে বলে থাকেন গদ্যের জন্ম আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাংলা গদ্যের জন্ম আধুনিক যুগেই হয় নি। বাঙালী যুগে-যুগে গদ্যের ব্যবহার চিরকালই প্রচলিত ছিল; দৈনন্দিন জীবনে বাঙালী যে আধুনিক যুগের আগে পদ্যে কথা বলত, তা নয়। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে গদ্য বাঙালীর দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ছিল সাহিত্যে তার প্রয়োগ সূচিত হল অর্থাৎ গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল।

(২) সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যেরও আবার দুটি রীতি গড়ে উঠল—সাধু ও চলিত। মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ইত্যাদি) কথ্যভাষার উপরে ভিত্তি করে চলিত গদ্যের রূপ গড়ে তোলা হয়েছিল, অন্যদিকে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলার শব্দরূপ-ধাতুরূপ ও প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার নিয়ে সাধু গদ্য গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও সাধু এবং চলিত গদ্যের ধারা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তবু উনবিংশ শতাব্দীতে সাধুগদ্যের ধারাটিই অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টি লাভ করেছিল। পরে ক্রমে চলিত গদ্যের ধারাটি একচ্ছত্র হয়ে উঠে।

(৩) সাধুভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর দীর্ঘরূপ ছিল। যেমন—করিয়া, করিয়াছিল, তাহার, যাহার, হইতে ইত্যাদি। চলিত ভাষার এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হল। যেমন—করে, করেছিল, তার, যার, হতে, থেকে ইত্যাদি।

(৪) মধ্যযুগের বাংলায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে অন্ত-মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হ
(যেমন—করিয়া > কইর্যা ইত্যাদি) ; আধুনিক যুগের আদর্শ চলিত বাংলায়

নব্য ভারতীয় আর্যে প্রথমায় প্রায়ই শূন্য বিভক্তি (অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা) দেখা যায়। এ ছাড়া তৃতীয়ার অবক্ষয়-জাত বিভক্তিও নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায় যে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার ছিল তার অবক্ষয়িত রূপ থেকে বাংলায় কর্তৃকারকের -'এ' বিভক্তির প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন (সংস্কৃত 'পুত্রেণ খাদ্যতে' > অপভ্রংশে 'পুত্তে খাইঅই' > বাংলা 'পুতে খায়')। অর্থাৎ মুখ্য কারকে (কর্তৃকারকে) হয় শূন্য বিভক্তি, নয় তৃতীয়ার অবক্ষয়জাত বিভক্তি প্রচলিত হল। আর গৌণ কারকে বা তির্যক্ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ করে তার সঙ্গে অনুসর্গ যোগের রীতি প্রচলিত হল। যেমন—বাংলা 'আমার সঙ্গে', হিন্দী 'মেরে সাথ্' ।

(ঘ) অধিকাংশ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল না। সেসব ভাষায় বহুবচন বোঝায় শব্দের পৃথক্ রূপ দিয়ে নয়, বহুত্ববাচক পৃথক্ শব্দ দিয়ে অথবা ষষ্ঠী বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ দিয়ে। যেমন—বাংলা পুরুষ + এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) = পুরুষের > পুরুষেরা। কিন্তু পশ্চিমা হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী প্রভৃতি কয়েকটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের পৃথক্ রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পশ্চিমা হিন্দী একবচন—লড়কা, বহুবচন—লড়কে, একবচন—বাত, বহুবচন—বাতেঁ (< বার্তানি)। এরকম রূপভেদ অবশ্য পশ্চিমা হিন্দীতেও সব শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কোনো-কোনো শব্দের বহুবচনে পৃথক্ রূপ হয় না, বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন—হিন্দীতে একবচন—সন্ত্, বহুবচন—সন্তলোগ্, একবচন—আপ্, বহুবচন—আপ্লোগ্। বিভক্তি যোগ না করে শুধু শব্দের দ্বিত্ব করে অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন—বাংলা 'দলে দলে যোগদান করুন', হিন্দী 'বাত বাত মে' (= কথায়-কথায়)।

(ঙ) নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ারূপেও সরলীকরণ হয়েছে খুব বেশী। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচ ভাবে (Mood) ও পাঁচ কালে পৃথক্-পৃথক্ রূপ ছিল, এই রূপবৈচিত্র্য সাধিত হত পৃথক্-পৃথক্ বিভক্তি যোগ করে। নব্য ভারতীয় আর্যে শুধু কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাব বাচ্যে বর্তমানের বিভক্তি-ঘটিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, আর ভাবের মধ্যে শুধু বর্তমান কালে নির্দেশক ও অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র রূপ আছে। অন্যদিকে অতীত কালের রূপ রচিত হয় নিষ্ঠা প্রত্যয়, আর ভবিষ্যৎ কালের রূপ রচিত হয় শতৃ প্রত্যয় যোগে। যেমন √চল্ + ত = চলিত-এর অনুসরণে √চল্ + ইল্ল বাংলা—চলিল, ভোজপুরী—

চলল (এখানে ল/ইল হল নিষ্ঠা প্রত্যয়)। শতৃ-প্রত্যয় অন্ত>অন্/ই, √চল্+অব=ভোজপুরী চলব।

(চ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক কালের রূপ-দেখা দিল। যেমন—বাংলা √কর + ইয়া (এ)+√আছ্+এ করেছে। (এখানে কর্ ও আছ্—দুটি ধাতু মিলে একটি ক্রিয়াপদ হয়েছে)।

(৩) বাক্য গঠনগত ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে গঠিত বাক্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতেও কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যের গঠনে পার্থক্য আছে। তবে ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়—প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কর্মবাচ্যের বাক্য পরিবর্তিত হয়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃবাচ্যের বাক্যরূপে প্রচলিত হয়েছে। যেমন—ময়া পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য)> আমি পুথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)। আরো একটি লক্ষণীয় দিক হল—ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কর্মবাচ্যে গঠিত বাক্যের বহুল প্রচলন ছিল, কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যে কর্মবাচ্যের বাক্যের ব্যবহার সাধারণ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মবাচ্যের ব্যবহার শোভন মনে হয়। যেমন—বাংলায়—আমাকে দিয়ে একাজ হবে না (কর্মবাচ্য), হিন্দীতে মুঝসে যহ্ কাম্ নহী' হোগা (কর্মবাচ্য)। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশী নেই।

(খ) বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের (Parts of Speech) কারক বিভক্তি চিহ্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। ফলে বাক্যে কোন্ পদ কর্তা, কোন্‌টি কর্ম ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তিচিহ্ন থেকে চেনা যায় না, বাক্যের মধ্যে পদের অবস্থান থেকে চেনা যায়। এইকারণে বাক্যে অনেক ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি পদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এই স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হয়। যেমন :—বাংলায়—মানুষ কোনো-কোনো বন্যপ্রাণী খায়' (এখানে 'মানুষ' কর্তা, বাক্যের প্রথমে বসেছে)। কিন্তু 'কোনো-কোনো বন্যপ্রাণী মানুষ খায়' (এখানে মানুষ কর্ম, ক্রিয়ার আগে বসেছে)।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ছন্দোরীতি হল মাত্রামূলক ও স্বরাঘাতমূলক এবং অধিকাংশ ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস প্রচলিত হল। অতি আধুনিক কালে নব্য আর্যভাষাগুলিতে গদ্যছন্দের ব্যবহার বহু প্রচলিত হওয়ায় সমমাত্রিক অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোরীতিও প্রায় অচল হয়ে গেছে।

নব্য ভারতীয় আর্যে প্রথমায় প্রায়ই শূন্য বিভক্তি (অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা) দেখা যায়। এ ছাড়া তৃতীয়ার অবক্ষয়-জাত বিভক্তিও নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায় যে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার ছিল তার অবক্ষয়িত রূপ থেকে বাংলায় কর্তৃকারকের '-এ' বিভক্তির প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন (সংস্কৃত 'পুত্রেণ খাদ্যতে' > অপভ্রংশ 'পুত্তেঁ খাইঅই' > বাংলা 'পুতে খায়')। অর্থাৎ মুখ্য কারকে (কর্তৃকারকে) হয় শূন্য বিভক্তি, নয় তৃতীয়ার অবক্ষয়জাত বিভক্তি প্রচলিত হল। আর গৌণ কারকে বা তির্যক্ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ করে তার সঙ্গে অনুসর্গ যোগের রীতি প্রচলিত হল। যেমন—বাংলা 'আমার সঙ্গে', হিন্দী 'মেরে সাথ্'।

(খ) অধিকাংশ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল না। সেসব ভাষায় বহুবচন বোঝায় শব্দের পৃথক্ রূপ দিয়ে নয়, বহুবাচক পৃথক্ শব্দ দিয়ে অথবা ষষ্ঠী বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ দিয়ে। যেমন—বাংলা পুরুষ + এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) = পুরুষের > পুরুষেরা। কিন্তু পশ্চিমা হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী প্রভৃতি কয়েকটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের পৃথক্ রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পশ্চিমা হিন্দী একবচন—লড়কা, বহুবচন—লড়কে, একবচন—বাত, বহুবচন—বাতেঁ (< বার্তানি)। এরকম রূপভেদ অবশ্য পশ্চিমা হিন্দীতেও সব শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কোনো-কোনো শব্দের বহুবচনে পৃথক্ রূপ হয় না, বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন—হিন্দীতে একবচন—সব্, বহুবচন—সবলোগ্, একবচন—আপ্, বহুবচন—আপ্‌লোগ্। বিভক্তি যোগ না করে শুধু শব্দের দ্বিত্ব করে অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন—বাংলা 'দলে দলে যোগদান করুন', হিন্দী 'বাত বাত মেঁ' (= কথায়-কথায়)।

(গ) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপেও সরলীকরণ হয়েছে খুব বেশী। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচ ভাবে (Mood) ও পাঁচ কালে পৃথক্-পৃথক্ রূপ ছিল, এই রূপবৈচিত্র্য সাধিত হত পৃথক্-পৃথক্ বিভক্তি যোগ করে। নব্য ভারতীয় আর্যে শুধু কর্তৃবাচ্যে ও কর্মভাব বাচ্যে বর্তমানের বিভক্তি-ঘটিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, আর ভাবের মধ্যে শুধু বর্তমান কালে নির্দেশক ও অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র রূপ আছে। অন্যদিকে অতীত কালের রূপ রচিত হয় নিষ্ঠা প্রত্যয়, আর ভবিষ্যৎ কালের রূপ রচিত হয় শতৃ প্রত্যয় যোগে। যেমন √চল্ + ত = চলিত-এর অনুসরণে √চল্ + ইল্ বাংলা—চলিল, ভোজপুরী—